একটি তুলসী গাছের কাহিনী

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

ধনুকের মতো বাঁকা কংক্রিটের পুলটির পরেই বাড়িটা। দোতলা, উঁচু এবং প্রকান্ড বাড়ি। তবে রাস্তা থেকেই সরাসরি দন্ডায়মান। এদেশে ফুটপাত নাই বলে বাড়িটারও একটু জমি ছাড়ার ভদ্রতার বালাই নাই। তবে সেটা কিন্তু বাইরের চেহারা। কারণ, পেছনে অনেক জায়গা। প্রথমত প্রশস্ত উঠান। তারপর পায়খানা-গোসলখানার পরে আম-জাম-কাঁঠাল গাছে ভরা জঙ্গলের মতো জায়গা। সেখানে কড়া সূর্যালোকেও সূর্যাস্তের ম্লান অন্ধকার এবং আগাছায় আবৃত মাটিতে ভাপসা গন্ধ।

অত জায়গা যখন তখন সামনে কিছু ছেড়ে একটা বাগান করলে কী দোষ হতো?

সে-কথাই এরা ভাবে। বিশেষ করে মতিন। তার বাগানের বড় শখ, যদিও আজ পর্যন্ত তা কল্পনাতেই পুত হয়েছে। সে ভাবে, একটু জমি পেলে সে নিজেই বাগানের মতো করে নিতো। যত্ন করে লাগাতো মৌসুমি ফুল, গন্ধরাজ-বকুল-হাস্নাহেনা, দু-চারটে গোলাপও। তারপর সন্ধ্যার পর আপিস ফিরে সেখানে বসতো। একটু আরাম করে বসবার জন্যে হাল্কা বেতের চেয়ার বা ক্যানভাসের ডেকচেয়ারই কিনে নিতো। তারপর গা ঢেলে বসে গল্প-গুজব করতো। আমজাদের হুকার অভ্যাস। বাগানের সম্মান বজায় রেখে সে না হয় একটা মানানসই নলওয়ালা সুদৃশ্য গুড়গুড়ি কিনে নিতো। কাদের গল্প-প্রেমিক। ফুরফুরে হাওয়ায় তার কণ্ঠ কাহিনীময় হয়ে উঠতেত। কিংবা পুষ্পসৌরভে মদির জ্যোৎস্নারাতে গল্প না করলেই বা কী এসে যেতো? এমনিতে চোখ বুজে বসেই নীরবে সান্ধ্যকালীন স্নিগ্ধতা উপভোগ করতো তারা।

আপিস থেকে শ্রান্ত হয়ে ফিরে প্রায় রাস্তা থেকেই চড়তে থাকা দোতলায় যাবার সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে মতিনের মনে জাগে এসব কথা।

বাড়িটা তারা দখল করেছে। অবশ্য লড়াই না করেই; তাদের সামরিক শক্তি অনুমান করে বাড়ির মালিক যে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল, তা নয়। দেশভঙ্গের হুজুগে এ শহরে এসে তারা যেমন তেমন একটা ডেরার সন্ধানে উদয়াস্ত ঘুরছে, তখন একদিন দেখতে পায় বাড়িটা। সদর দরজায় মস্ত তালা, কিন্তু সামান্য পর্যবেক্ষণের পর বুঝতে পারে বাড়িতে জনমানব নাই এবং তার মালিক দেশপলাতক। পরিত্যক্ত বাড়ি চিনতে দেরি হল না। কিন্তু এমন বাড়ি পাওয়া নিতান্ত সৌভাগ্যের কথা। সৌভাগ্যের আকস্মিক আবির্ভাবে প্রথমে তাদের মনে ভয়ই উপস্থিত হয়। সে ভয় কাটতে দেরি হয় না। সেদিন সন্ধ্যায় তারা সদলবলে এসে দরজার তালা ভেঙে রৈ-রৈ আওয়াজ তুলে বাড়িটায় প্রবেশ করে। তাদের মধ্যে তখন বৈশাখের আম-কুড়ানো ক্ষিপ্র উন্মাদনা বলে ব্যাপারটা

তাদের কাছে দিন-দুপুরে ডাকাতির মতো মনে হয় না। কোন অপরাধের চেতনা যদি বা মনে জাগার প্রয়াস পায় তা বিজয়ের উল্লাসে নিমেষে তুলোধুনো হয়ে উড়ে যায়।

পরদিন শহরে খবরটা ছড়িয়ে পড়লে অনাশ্রিতদের আগমন শুরু হয়। মাথার ওপর একটা ছাদ পাবার আশায় তারা দলে-দলে আসে।

বিজয়ের উল্লাসটা ঢেকে এরা বলে, কী দেখছেন? জায়গা নাই কোথাও। সব ঘরেই বিছানা পড়েছে। এই যে ছোট্ট ঘরটি, তাতেও চার-চারটে বিছানা পড়েছে। এখন তো শুধু বিছানা মাত্র। পরে ছ-ফুট বাই আড়াই-ফুট চারটি চৌকি এবং দু-একটা চেয়ার-টেবিল এলে পা ফেলার জায়গা থাকবে না।

একজন সমবেদনার কণ্ঠে বলে,

আপনাদের তক্লিফ আমরা কি বুঝি না? একদিন আমরা কি কম কষ্ট পেয়েছি? তবে আপনাদের কপাল মন্দ। সেই হচ্ছে আসল কথা।

যারা হতাশ হয় তাদের মুখ কালো হয়ে ওঠে সমবেদনা ভরা উক্তিতে।

ঐ ঘরটা?

নিচের তলার রাস্তার ধারে ঘরটা অবশ্য খালিই মনে হয়।

খালি দেখালেও খালি নয়। ভাল করে চেয়ে দেখুন। দেয়ালের পাশে সতরঞ্জিতে বাঁধা দুটি বেডিং। শেষ জায়গাটাও দু-ঘণ্টা হল অ্যাকাউন্টস এর মোটা বদরুদ্দিন নিয়ে নিয়েছে। শালার কাছ থেকে বিছানাপত্তর আনতে গেছে। শালাও আবার তার এক দোস্তের বাড়ির বারান্দায় আস্তানা গেড়েছে। পরিবার না থাকলে শালাটিও এসে হাজির হত।

নেহাত কপালের কথা। আবার একজনের কণ্ঠ সমবেদনায় খলখল করে ওঠে। যদি ঘণ্টা দুয়েক আগে আসতেন তবে বদরুদ্দিনকে কলা দেখাতে পারতেন। ঘরটায় তেমন আলো নেই বটে কিন্তু দেখুন জানালার পাশেই সরকারি আলো। রাতে কোনদিন ইলেকট্রিসিটি ফেল করলে সে-আলোতেই দিব্যি চলে যাবে।

বা কিপ্পনতা যদি করতে চায়-

অবশ্য এ-সব পরাহত বাড়ি-সন্ধানীদের কানে বিষবৎ মনে হয়।

যথাসময়ে বেআইনি বাড়ি দখলের ব্যাপারটা তদারক করাবার জন্যে পুলিশ আসে। সেটা স্বাভাবিক। দেশেময় একটা ঘোর পরিবর্তনের আলোড়ন বটে কিন্তু কোথাও যে রীতিমত মগের মুলুক পড়েছে তা নয়। পুলিশ দেখে

তারা ভাবে, পলাতক গৃহকর্তা কি বাড়ি উদ্ধারের জন্যে সরকারের কাছে আবেদন করেছে? তবে সে-কথা বিশ্বাস হয় না দু-দিনের মধ্যে বাড়িটা খালি করে দিয়ে যে দেশ থেকে উধাও হয়ে গেছে বর্তমানে তার অন্যান্য গভীর সমস্যার কথা ভাববার আছে। সন্দেহ থাকে না যে, পুলিশকে খবর দিয়েছে তারাই যারা সময় মতো এখানে না এসে শহরের অন্য কোন প্রান্তে নিষ্ফলভাবে বাড়ি দখলের ফিকিরে ছিল। মন্দভাগ্যের কথা মানা যায় কিন্তু সহ্য করা যায় না। ন্যায্য অধিকারস্বত্ব এক কথা, অন্যায়ের ওপর ভাগ্য লাভ অন্য কথা।

হিংসাটা ন্যায়সঙ্গত-তো মনে হয়-ই, কর্তব্য বলেও মনে হয়।

এরা রূখে দাঁড়ায়।

আমরা দরিদ্র কেরানি মানুষ বটে কিন্তু সবাই ভদ্র ঘরের ছেলে। বাড়ি দখল করেছি বটে কিন্তু জানালা-দরজা ভাঙি নাই, ইট-পাথর খসিয়ে চোরাবাজারেও চালান করে দিই নাই।

আমরাও আইন-কানুন বুঝি। কে নালিশ করেছে? বাড়িওয়ালা নয়। তবে নালিশটাও যথাযথ নয়।

কাদের কেবল কাতর রব তোলে। যাবো কোথায়? শখ করে কি এখানে এসে উঠেছি? সদলবলে সাব ইনস্পেক্টর ফিরে গিয়ে না-হক না বেহক না-ভালো না-মন্দ গোছের ঘোর-ঘোরালো রিপোর্ট দেয় যার মর্মার্থ উদ্ধারের ভয়েই হয়তো ওপরওয়ালা তা ফাইল চাপা দেয়া শ্রেয় মনে করে। অথবা বুঝতে পারে, এই হুজুগের সময় অন্যায়ভাবে বাড়ি দখলের বিষয়ে সরকারি আইনটা যেন তেমন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না।

কাদের চোখ টিপে বলে, সত্য কথা বলতে দোষ কী? সাব-ইনস্পেক্টরের দ্বিতীয় বউ আমার এক রকম আত্মীয়া। বলো না কাউকে কিন্তু।

কথাটা অবশ্য কারোরই বিশ্বাস হয় না। তবে অসত্যটির গোড়ায় যে কেবল একটা নির্মল আনন্দের উস্কানি, তা বুঝে কাদেরকে ক্ষমা করতে দ্বিধা হয় না।

উৎফুল্ল কণ্ঠে কেউ প্রস্তাব করে, কী হে, চা-মিষ্টিটা হয়ে যাক।

রাতারাতি সরগরম হয়ে ওঠে প্রকান্ড বাড়িটা। আস্তানা একটি পেয়েছে এবং সে আস্তানাটি কেউ হাত থেকে কেড়ে নিতে পারবে না।-শুধু এ বিশ্বাসই তার কারণ নয়। খোলা-মেলা ঝরঝরে তকতকে এ বাড়ি তাদের মধ্যে একটা নতুন জীবন-সঞ্চার করেছে যেন। এদের অনেকেই কলকাতায় ব্লকম্যান লেন-এ খালাসি পট্টিতে, বৈঠকখানায় দফতরিদের পাড়ায় সৈয়দ সালেহ লেন-এ তামাক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বা কমরু খানসামা লেন-এ অকথ্য দুর্গন্ধ নোংরার মধ্যে দিন কাটিয়েছেন। তুলনায় এ বাড়ির বড় বড় কামরা, নীলকুঠি দালানের ফ্যাশানে মস্ত মস্ত জানালা, খোলামেলা উঠান, আরো পেছনে বনজঙ্গলের মতো আম-জাম-কাঁঠালের বাগান-এসব একটি ভিন্ন দুনিয়া যেন। এরা লাটবেলাটের মতো এক খানা ঘর দখল করে নাই সত্য, তবু এত আলো বাতাস কখনো

তারা উপভোগ করে নাই। তাদের জীবনে সবুজ তৃণ গজাবে ধমনীতে সবল সতেজ রক্ত আসবে, হাজার-দুহাজার ওয়ালাদের মতো মুখে ধন-স্বাস্থ্যের জৌলুস আসবে, দেহও ম্যালেরিয়া-কালাজ্বর-ক্ষয় ব্যাধিমুক্ত হবে। রোগাপটকা ইউনুস ইতিমধ্যে তার স্বাস্থ্যের পরিবর্তন দেখতে পায়। সে থাকতো ম্যাকলিওড স্ট্রিটে। গলিটা যেন সকালবেলার আবর্জনা ভরা ডাস্টবিন। সে গলিতেই নড়বড়ে ধরনের একটা কাঠের দোতলা বাড়িতে রান্নাঘরের পাশে স্যাঁৎসেতে একটি কামরায় কচ্ছদেশীয় চামড়া ব্যবসায়ীদের সঙ্গে চার বছর সে বাস করেছে। পাড়াটি চামড়ার উৎকট গন্ধে সর্বক্ষণ এমন ভরপুর হয়ে থাকতো যে রাস্তার ড্রেনের পচা দুর্গন্ধ নাকে পৌঁছতো না, ঘরের কোণে ইঁদুর বেড়াল মরে পচে থাকলেও তার খবর পাওয়া দুষ্কর ছিল। ইউনুসের জ্বরজ্বারি লেগেই থাকতো, থেকে থেকে শেষরাতে কাশির ধমক উঠতো। তবু পাড়াটি ছাড়ে নি এক কারণে। কে তাকে বলেছিল, চামড়ার গন্ধ নাকি যক্ষ্মার জীবাণু ধ্বংস করে। দুর্গন্ধটা তাই সে অম্লানবদনে সহ্য তো করতোই, সময় সময় আপিস থেকে ফিরে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে পাশের বাড়ির নিছিদ্র দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বুকভরে নিশ্বাস নিতো। তাতে অবশ্য তার স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি দেখা যায় নাই।

খানাদানা না হলে বাড়ি সরগরম হয় না। তাই এক সপ্তাহ ধরে মুঘলাই কায়দায় তারা খানাদানা করে। রান্নার ব্যাপারে সকলেরই গুপ্ত কেরামতি প্রকাশ পায় সহসা। নানির হাতে শেখা বিশেষ পিঠা তৈরির কৌশলটি শেষ পর্যন্ত অখাদ্য বস্তুতে পরিণত হলেও তারিফ প্রশংসায় তা মুখরোচক হয়ে ওঠে। গানের আসরও বসে কোন কোন সন্ধ্যায়। হাবিবুল্লা কোত্থেকে একটা বেসুরো হারমনিয়াম নিয়ে এসে তার সাহায্যে নিজের গলার বলিষ্ঠতার ওপর ভর করে নিশীথ রাত পর্যন্ত একটি অবক্তব্য সঙ্গীতসমস্যা সৃষ্টি করে।

এ সময়ে একদিন উঠানের প্রান্তে রান্নাঘরের পেছনে চৌকোণা আধ হাত উঁচু ইটের তৈরি একটি মঞ্চের ওপর তুলসী গাছটি তাদের দৃষ্টিগত হয়।

সেদিন রোববার সকাল। নিমের ডাল দিয়ে মেছোয়াক করতে করতে মোদাবেবর উঠানে পায়চারি করছিল, হঠাৎ সে তারস্বরে আর্তনাদ করে ওঠে। লোকটি এমনিতেই হুজুগে মানুষ। সামান্য কথাতেই প্রাণ-শীতল-করা রৈ-রৈ আওয়াজ তোলার অভ্যাস তার। তবু সে আওয়াজ উপেক্ষা করা সহজ নয়। শীঘ্রই কেউ কেউ ছুটে আসে উঠানে।

কী ব্যাপার!

চোখ খুলে দেখ!

কী? কী দেখবো?

সাপখোপ দেখবে আশা করেছিল বলে প্রথমে তুলসী গাছটা নজরে পড়ে না তাদের। দেখছো না? এমন বেকায়দা আসনাধীন তুলসী গাছটা দেখতে পাচ্ছো না? উপড়ে ফেলতে হবে ওটা। আমরা যখন এ বাড়িতে এসে উঠেছি তখন এখানে কোন হিন্দুয়ানির চিহ্ন আর সহ্য করা হবে না।

একটু হতাশ হয়ে তারা তুলসী গাছটির দিকে তাকায়। গাছটি কেমন যেন মরে আছে। গাঢ় সবুজ রঙের পাতায় খয়েরি রং ধরেছে। নিচে আগাছাও গজিয়েছে। হয়তো বহুদিন তাতে পানি পড়েনি।

কী দেখছো? মোদাবেবর হুঙ্কার দিয়ে ওঠে। বলছি না, উপড়ে ফেল!

এরা কেমন স্তব্ধ হয়ে যায়। আকস্মিক এ আবিষ্কারে তারা যেন কিছুটা হতভম্ব হয়ে পড়েছে। যে বাড়ি এত শূন্য মনে হয়েছিল, ছাদে যাওয়ার সিঁড়ির দেয়ালে কাঁচা হাতে লেখা ক-টা নাম থাকা সত্ত্বেও যে বাড়িটা এমন বেওয়ারিশ ঠেকেছিল, সে বাড়ির চেহারা যেন হঠাৎ বদলে গেছে। আচমকা ধরা পড়ে গিয়ে শুষ্কপ্রায় মৃতপ্রায় নগণ্য তুলসী গাছটি হঠাৎ সে বাড়ির অন্দরের কথা প্রকাশ করেছে যেন।

এদের অহেতুক স্তব্ধতা লক্ষ করে মোদাবেবর আবার হুঙ্কার ছাড়ে।

ভাবছো কী অত? উপড়ে ফেলো বলছি।

কেউ নড়ে না। হিন্দু রীতিনীতি এদের তেমন ভাল করে জানা নাই। তবুও কোথাও শুনেছে যে, হিন্দুবাড়িতে প্রতি দিনান্তে গৃহকর্ত্রী তুলসী গাছের তলে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালায়, গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করে। আজ যে তুলসী গাছের তলে ঘাস গজিয়ে উঠেছে, সে পরিত্যক্ত তুলসী গাছের তলেও প্রতিসন্ধ্যায় কেউ প্রদীপ দিতো। আকাশে যখন সন্ধ্যাতারা বলিষ্ঠ একাকিত্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠতো, তখন ঘনায়মান ছায়ার মধ্যে আনত সিঁদুরের নীরব রক্তাক্ত স্পর্শে একটা শান্ত-শীতল প্রদীপ জ্বলে উঠতো প্রতিদিন। ঘরে দুর্দিনের ঝড় এসেছে, হয়তো কারো জীবন প্রদীপ নিভে গেছে, আবার হাসি-আনন্দের ফোয়ারাও ছুটেছে সুখ-সময়ে, কিন্তু এ প্রদীপ দেওয়া অনুষ্ঠান একদিনের জন্যও বন্ধ থাকে নাই।

যে-গৃহকর্ত্রী বছরের পর বছর এ তুলসী গাছের তলে প্রদীপ দিয়েছে সে আজ কোথায়? মতিন এক সময়ে রেলওয়েতে কাজ করতো। অকারণে তার চোখের সামনে বিভিন্ন রেলওয়ে-পট্টির ছবি ভেসে ওঠে। ভাবে, হয়তো আসানসোল, বৈদ্যবাটি, লিলুয়া বা হাওড়ায় রেলওয়ে-পট্টিতে সে মহিলা কোন আত্মীয়ের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। বিশাল ইয়ার্ডের পাশে রোদে শুকোতে-থাকা লাল পাড়ের একটি মসৃণ কালো শাড়ি সে যেন দেখতে পায়। হয়তো সে শাড়িটি গৃহকর্ত্রীরই। কেমন বিষণ্নভাবে সে শাড়িটি দোলে স্বপ্ন হাওয়ায়। অথবা মহিলাটি কোন চলতি ট্রেনের জানালার পাশে যেন বসে। তার দৃষ্টি বাইরের দিকে। সে দৃষ্টি খোঁজে কিছু দূরে, দিগন্তের ওপারে। হয়তো তার যাত্রা এখনো শেষ হয় নাই। কিন্তু যেখানেই সে থাকুক এবং তার যাত্রা এখনো শেষ হয়েছে কি হয়

নাই, আকাশে যখন দিনান্তের ছায়া ঘনিয়ে ওঠে তখন প্রতিদিন এ তুলসী তলার কথা মনে হয় বলে তার চোখ হয়তো ছলছল করে ওঠে।

গতকাল থেকে ইউনুসের সর্দি-সর্দি ভাব। সে বলে,

থাক না ওটা। আমরা তো তা পূজা করতে যাচ্ছি না। বরঞ্চ ঘরে তুলসী গাছ থাকা ভাল। সর্দি-কফে তার পাতার রস বড়ই উপকারী।

মোদাবেবর অন্যদের দিকে তাকায়। মনে হয়, সবারই যেন তাই মত। গাছটি উপড়ানোর জন্যে কারো হাত এগিয়ে আসে না। ওদের মধ্যে এনায়েত একটু মৌলভি ধরনের মানুষ। মুখে দাড়ি, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজও আছে, সকালে নিয়মিত ভাবে কুরআন-তেলাওয়াত করে। সে পর্যন্ত চুপ। প্রতি সন্ধ্যায় গৃহকর্ত্রীর সজল চোখের দৃশ্যটি তার মনেও জাগে কি?

অক্ষত দেহে তুলসী গাছটি বিরাজ করতে থাকে।

তবে এদের হাত থেকে রেহাই পেলেও এরা যে তার সম্বন্ধে পর মুহূর্তেই অসচেতনায় নিমজ্জিত হয় তা নয়। বরঞ্চ কেমন একটা দুর্বলতার ভাব, কর্তব্যের সম্মুখে পিছ-পা হলে যেমন একটা অস্বচ্ছন্দতা আসে তেমন একটা অস্বচ্ছন্দতা তাদের মনে জেগে থাকে। তারই ফলে সেদিন সান্ধ্য আড্ডায় তর্ক ওঠে। তারা বাকবিতন্ডার স্রোতে মনের সে দুর্বলতা অস্বচ্ছন্দতা ভাসিয়ে দিতে চায় যেন। আজ অন্যান্য দিনের মতো রাষ্ট্রনৈতিক-অর্থনৈতিক আলোচনার বদলে সাম্প্রদায়িকতাই তাদের প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে।

- ওরাই তো সবকিছুর মূলে, মোদাবেবর বলে। উলঙ্গ বালব্-এর আলোয় তার সযত্নে মেছোয়াক করা দাঁত ঝকঝক করে। তাদের নীচতা হীনতা গোঁড়ামির জন্যেই তো দেশটা ভাগ হলো।

কথাটা নতুন নয়। তবু আজ সে উক্তিতে নতুন একটা ঝাঁঝ। তার সমর্থনে এবার হিন্দুদের অবিচার-অত্যাচারের অশেষ দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়। অল্প সময়ের মধ্যে এদের রক্ত গরম হয়ে ওঠে, শ্বাস-প্রশ্বাস সংকীর্ণ হয়ে আসে।

দলের মধ্যে বামপন্থী বলে স্বীকৃত মকসুদ প্রতিবাদ করে। বলে, বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে না কী? মোদাবেবরের ঝকঝকে দাঁত ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

বাড়াবাড়ি মানে?

বামপন্থী মকসুদ আজ একা। তাই হয়তো তার বিশ্বাসের কাঁটা নড়ে। সংশয়ে দুলে দুলে কাঁটাটি ডান দিকে হেলে থেমে যায়।

কয়েকদিন পরে রান্নাঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় তুলসী গাছটা মোদাবেবরের নজরে পড়ে। সে একটু বিস্মিত না হয়ে পারে না। তার তলে যে আগাছা জন্মেছিল সে আগাছা অদৃশ্য হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়। যে গাঢ় সবুজ পাতাগুলি পানির অভাবে শুকিয়ে খয়েরি রং ধরেছিল, সে পাতাগুলি কেমন সতেজ হয়ে উঠেছে। সন্দেহ থাকে না যে তুলসী গাছটির যত্ন নিচ্ছে কেউ। খোলাখুলিভাবে না হলেও লুকিয়ে লুকিয়ে তার গোড়ায় কেউ পানি দিচ্ছে। মোদাবেবরের হাতে তখন একটি কঞ্চি। সেটি সাঁ করে কচুকাটার কায়দায় সে তুলসী গাছের ওপর দিয়ে চালিয়ে দেয়। কিন্তু ওপর দিয়েই। তুলসীগাছটি অক্ষত দেহেই থাকে।

অবশ্য তুলসী গাছের কথা কেউ উল্লেখ করে না। ইউনুসের সর্দি-সর্দি ভাবটা পরদিন কেটে গিয়েছিল। তুলসী পাতার রসের প্রয়োজন হয় নাই তার।

তারা ভেবেছিল ম্যাকলিওড স্ট্রিট খানসামা লেন ব্লকম্যানের জীবন সত্যিই পেছনে ফেলে এসে প্রচুর আলো হাওয়ার মধ্যে নতুন জীবন শুরু করেছে। কিন্তু তাদের ভুলটা ভাঙতে দেরি হয় না। তবে শুধু ততখানিই দেরি হয় যতখানি দরকার, সে বিশ্বাস দৃঢ় প্রমাণিত হবার জন্যে। ফলে আচম্বিত আঘাতটা প্রথমে নিদারুণই মনে হয়!

সেদিন তারা আপিস থেকে সরাসরি বাড়ি ফিরে সকালের পরিকল্পনা মোতাবেক খিচুড়ি রান্নার আয়োজন শুরু করেছে এমন সময় বাইরে সিঁড়িতে ভারি জুতার মচমচ আওয়াজ শোনা যায়। বাইরে একবার উঁকি দিয়ে মোদাবেবর ক্ষিপ্রপদে ভেতরে আসে।

পুলিশ এসেছে আবার। সে ফিসফিস করে বলে।

পুলিশ? আবার কেন পুলিশ? ইউনুস ভাবে, হয়তো রাস্তা থেকে ছ্যাঁচড়া চোর পালিয়ে এসে বাড়িতে ঢুকেছে এবং তারই সন্ধানে পুলিশের আগমন হয়েছে। কথাটা মনে হতেই নিজের কাছেই তা খরগোশের গল্পের মতো ঠেকে। শিকারির সামনে আর পালাবার পথ না পেয়ে হঠাৎ চোখ বুঝে বসে পড়ে খরগোশ ভাবে, কেউ তাকে আর দেখতে পাচ্ছে না। আসলে তারাই কি চোর নয়? সব জেনেও তারাই কি সত্য কথাটা স্বীকার না করে এ বাড়িতে একটি অবিশ্বাস্য মনোরম জীবন সৃষ্টি করেছে নিজেদের জন্য?

পুলিশ দলের নেতা সাবেকি আমলের মানুষ। হ্যাট বগলে চেপে তখন সে দাগ-পড়া কপাল থেকে ঘাম মুছছে। কেমন একটা নিরীহ ভাব। তার পশ্চাতে বন্দুকধারী কনেস্টবল দুটিকেও মস্ত গোঁফ থাকা সত্ত্বেও নিরীহ মনে হয়। তাদের দৃষ্টি ওপরের দিকে। তারা যেন কড়িকাঠ গোণে। ওপরের ঝিলিমিলির খোপে একজোড়া কবুতর বাসা বেঁধেছে। হয়তো সে কবুতর দুটিকেই দেখে চেয়ে। হাতে বন্দুক থাকলে নিরীহ মানুষেরও দৃষ্টি পড়ে পশু-পক্ষীর দিকে।

সবিনয়ে মতিন প্রশ্ন করে, কাকে দরকার?

আপনাদের সবাইকে। পুলিশদের নেতা একটু খনখনে গলায় ঝট করে উত্তর দেয়। আপনারা বেআইনীভাবে এ বাড়িটা কব্জা করেছেন।

কথাটা না মেনে উপায় নাই। ওরা প্রতিবাদ না করে সরল চোখে সামান্য কৌতূহল জাগিয়ে পুলিশদের নেতার দিক চেয়ে থাকে।

চবিবশ ঘণ্টার মধ্যে বাড়ি ছাড়তে হবে। সরকারের হুকুম।

এরা নীরবে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। অবশেষে মোদাবেবর গলা সাফ করে প্রশ্ন করে, কেন, বাড়িওয়ালা নালিশ করেছে নাকি?

অ্যাকাউন্টস আপিসের মোটা বদরুদ্দিন গলা বাড়িয়ে কনেস্টবল দুটির পেছনে একবার তাকিয়ে দেখে বাড়িওয়ালার সন্ধানে। সেখানে কেউ নেই। তবে রাস্তায় কিছু লোক জড়ো হয়েছে। অন্যের অপমান দেখার নেশা বড় নেশা।

কোথায় বাড়িওয়ালা? না হেসেই গলায় হাসি তোলে পুলিশ দলের নেতা।

এদের একজনও হেসে ওঠে। একটা আশার সঞ্চার হয় যেন।

তবে?

গভর্নমেন্ট বাড়িটা রিকুইজশন করেছে।

এবার হাসি জাগে না। বস্তুত অনেকক্ষণ যেন কারো মুখে কোন কথা সরে না। তারপর মকসুদ গলা বাড়ায়। আমরা কি গভর্নমেন্টের লোক নই?

এবার কনেস্টবল দুটির দৃষ্টিও কবুতর কড়িকাঠ ছেড়ে মকসুদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়।

তাদের দৃষ্টিতে সামান্য বিস্ময়ের ভাব। মানুষের নির্বুদ্ধিতায় এখনো তারা চমকিত হয়।

তারপর প্রকান্ড সে বাড়িতে অপর্যাপ্ত আলোবাতাস থাকলেও একটা গভীর ছায়া নেমে আসে। প্রথমে অবশ্য তাদের মাথায় খুন চড়ে। নানারকম বিদ্রোহী ঘোষণা শোনা যায়। তারা যাবে না কোথাও, ঘরের খুঁটি ধরে পড়ে থাকবে; যাবে তো লাশ হয়ে যাবে। তবে মাথা শীতল হতে দেরি হয় না। তখন গভীর ছায়া নেবে আসে সর্বত্র। কোথায় যাবে তারা?

পরদিন মোদাবেবর যখন এসে বলে তাদের মেয়াদ চবিবশ ঘণ্টা থেকে সাতদিন হয়েছে তখন তারা একটা গভীর স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লেও সে-ঘন ছায়াটা নিবিড় হয়েই থাকে। এবার মোদাবেবর পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টরে দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে তার আত্মীয়তার কথা বলে না। তবু না বলা কথাটা সবাই মেনে নেয়।

তারপর দশম দিনে তারা সদলবলে বাড়ি ত্যাগ করে চলে যায়। যেমনি ঝড়ের মতো এসেছিল, তেমনি ঝড়ের মতোই উধাও হয়ে যায়। শূন্য বাড়িতে তাদের সাময়িক বসবাসের চিহ্নস্বরূপ এখানে-সেখানে ছিটিয়ে থাকে খবর কাগজের ছেঁড়া পাতা, কাপড় ঝোলাবার একটা পুরোন দড়ি, বিড়ি-সিগারেটের টুকরো, একটা ছেঁড়া জুতোর গোড়ালি।

উঠানের শেষে তুলসী গাছটা আবার শুকিয়ে উঠেছে। তার পাতায় খয়েরি রং। সেদিন পুলিশ আসার পর থেকে কেউ তার গোড়ায় পানি দেয় নি। সেদিন থেকে গৃহকর্ত্রীর ছলছল চোখের কথাও আর কারো মনে পড়ে নি।

কেন পড়েনি সে কথা তুলসী গাছের জানবার কথা নয়, মানুষেরই জানবার কথা।